পরমাণু চুল্লির বিপদ, বিকল্প শক্তি ও বিকল্প ভাবনা-র বিশেষ সংখ্যা

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ জুলাই/আগষ্ট /২০১২ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য ২

তেজস্ক্রিয়তার অ আ ক খ

তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় দূষণ

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট যে সমস্ত পদার্থ স্বাভাবিক ভাবে অনবরত শক্তির বিকিরণে অন্য কোনো নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে। বস্তুর যে ধর্ম এর জন্য দায়ী তাকে তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) বলে। আর এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবাধ ও অদূরদর্শী ব্যবহারের ফলে পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যে দূষণ ঘটে তাকে তেজস্ক্রিয় দূষণ বলে। পারমানবিক বোমা তৈরিতে এবং বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হয়। সামান্য অদূরদর্শিতায় কিংবা দুর্ঘটনায় (যেমন জাপানের দাউচি) বায়ুতে এদের মাত্রাধিক্য ঘটে এবং সেই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি অনবরত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটিয়ে পরিবেশকে আরও দূষিত করে তোলে।

কারা ঘটায়

প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই দায়ী এই দূষণের জন্য। গত শতাব্দীর শেষে মেরী ক্যুরী যখন তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন তখন থেকে পারমানবিক বোমা তৈরীর আগে পর্যন্ত প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও তার

এরপর 2 পাতায়

বিকল্প শক্তি বিকল্প ভাবনা

পৃথিবীকে চালনা করে শক্তি— এমন কথা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি নয়। কারণ শক্তি সম্পদ ছাড়া সমগ্র পৃথিবীই যে অচল। বর্তমান পৃথিবী P_4 নামক চারটি প্রধান সমস্যায় আক্রান্ত। এরা হল — ১. Population 2. Poverty 3. Pollution and 4. Power—এর মধ্যে শক্তি সম্পদের সমস্যা অন্যতম। কারণ আমাদের পৃথিবী চালনার ক্ষেত্রে যে শক্তি সম্পদের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তা প্রধানতঃ চিরাচরিত বা প্রচলিত শক্তি। যেমন—কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানী বলে। এগুলি অপুর্নত্তর, গচ্ছিত ও ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রের। অর্থাৎ কিনা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে তা একদিন শেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী অধ্যায়ে কয়লাই ছিল প্রধান জ্বালানী। পরে ক্রমশ বিংশ শতকের যানবাহন (মোটরগাড়ি), বিমান ও বিদ্যুত শক্তির চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল খনিজ তেলের ব্যবহার। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যাও বাড়ল অনেক। শিল্পবিপ্লবের বিবিধ ফলাফল যে শুধু উন্নত দেশগুলিতেই পড়লো তা নয়, প্রভাব পড়লো অন্যান্য দেশগুলিতেও। ক্রমাগত শিল্পোন্নতির ফলে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র হল বিপন্ন। কলকারখানা, বিদ্যুকেন্দ্র, কার্বন জ্বালানী চালিত যানবাহন ও অন্যান্য নানান উৎস থেকে নির্গত বর্জ্য দূষণে পৃথিবীর বায়ু, জল, মৃত্তিকা তাই ভীষণ ভাবেই দূষিত এবং এই দূষণ এতটাই ভয়ংকর আকার ধারণ করছে যে, তা আমাদের অস্তিত্বের পক্ষেই মারাত্মক।

কিন্তু এর থেকে তো মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। কারণ প্রচলিত শক্তিগুলি যেভাবে দূষণ ছড়াচ্ছে এবং দ্রুত নিশেষিত হচ্ছে তা থেকে তো বাঁচার পথ খুঁজতে হবে। কারণ নইলে যে বিপদ আসন্ন। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের গরীব মানুষের তুলনায় ধনী ইউরোপ কিংবা উত্তর আমেরিকার মানুষ গড়ে প্রায় ১০ গুন বা তার বেশি শক্তি মাথা পিছু ব্যবহার করে। মাথা পিছু শক্তি ব্যবহারের (কিলোওয়াট)। চিত্রটি এই রকম—আমেরিকা ১১.৪,

এরপর 4 পাতায়

শক্তির নতুন উৎস সন্ধানে

এটা সবারই জানা যে বিশ্বে শক্তির সংকটের সময় আগত। যে উৎসগুলি এতকাল ধরে শক্তির সরবরাহ করে এসেছে যেগুলি নিঃশেষিত হতে চলেছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই শক্তির ব্যবহারে মানুষকে হিসেবী হতে হচ্ছে। গত বেশ কয়েক দশক ধরে

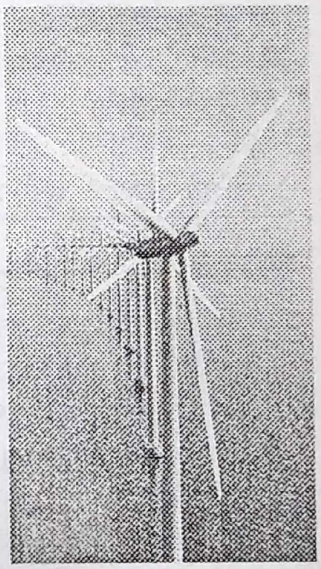

বিকল্প অচিরাচরিত শক্তির উৎস যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পারমানবিক তাপ শক্তি, সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ার ভাঁটার শক্তি, ভূগর্ভস্থ তাপশক্তির ব্যবহার সহ জৈবগ্যাস ও জৈব জ্বালানী (বায়ো ডিজেল) ইত্যাদির উপর নির্ভরতা বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে। বিজ্ঞানীরা ইন্ধন সাশ্রয়ী ও কম শক্তি ব্যবহার করে চালানোর মত

এরপর 3 পাতায়

তেজস্ক্রিয়তা

1 পাতার পর

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পরিমাণ ছিল, খুবই সামান্য। তার থেকে পরিবেশের ক্ষতির আকাঙ্খা ছিল সামান্য। কিন্তু আজ বিকল্প শক্তির নামে ব্যাপক হারে বেড়েছে পরমাণু চুল্লি ফলে প্রকৃতিতে জমছে হাজার হাজার টন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, বাড়ছে তেজস্ক্রিয় দূষণ। যাই হোক তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রধান উৎসগুলি হল ঃ—

উৎস	তেজস্ক্রিয় পদার্থ
১। প্রাকৃতিক বায়ু জল/সমুদ্র ভূত্বক	মহাজাগতিক রশ্মি, কার্বন ১৪, হাইড্রোজেন ৩ (ট্রাইটিয়াম) রেডন-২২২, রেডিয়াম-২২৬, রেডিয়াম-২২৮ ইত্যাদি ইউরেনিয়াম-২৩৫, বেরিয়াম ১৪২, ক্রিপটন-৯১।
২। মনুষ্য সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় আকরিকের প্রক্রিয়াকরণ	প্লুটোনিয়াম, ইউরেনিয়াম-২৩৮, থোরিয়াম-২৩০, ২২৮, রেডিয়াম-২২৬, লেড-২১০
৩। পারমানবিক চুল্লি	ইউরেনিয়াম-২৩৮, ২৩৫, বেরিয়াম-১৪২, ল্যান্থানিয়াম-১৪২, প্লুটোনিয়াম-২৩৯
৪। পারমানবিক বিস্ফোরণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় ট্রেসার	প্লুটোনিয়াম-২৩৯, ইউরেনিয়াম-২৩৫, ২৩৮, স্ট্রনসিয়াম-৯০, সিজিয়াম-১৩৭ কার্বন-১৪, আয়োডিন-১২৫

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ

পরিবেশে তেজস্ক্রিয় দূষণের পরিমান নির্ভর করে দূষক পদার্থের অর্ধায়ুর উপর এবং কোন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তার উপর। সাধারণত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তিন ধরনের রশ্মির বিকিরন ঘটে। এই রশ্মির ভেদন ক্ষমতার উপর জীবদেহের ক্ষতি নির্ভর করে।

১) আলফা রশ্মি ঃ—

এটি ধনাত্বক আধান যুক্ত কণা দিয়ে গঠিত। এর ভেদনক্ষমতা কম, ফলে মানুষের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমানও কম। প্লুটোনিয়াম আলফা কণা বিচ্ছিরণ করে।

২) বিটা রশ্মি ঃ—

ঋনাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণার স্রোত হল বিটা রশ্মি। এর ভেদন ক্ষমতা আলফা এবং এক্স (X) রশ্মির তুলনায় বেশি অর্থাৎ জীবদেহের পক্ষে তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর।

৩) গামা রশ্মি ঃ—

এরা নিস্তরিত অর্থাৎ আধানবিহীন তবে ভেদন ক্ষমতা সর্বাধিক। তাই এই রশ্মি জীবদেহের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর।

কিভাবে মাপবো ?

সাধারনত রেস (Roentgen Equivalent Man) একক দিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরনকে পরিমাপ করা হয়। এই রেম বুঝতে হলে প্রথমে রঞ্জন কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রঞ্জন এককের সাহায্যে এক্স (X) অথবা গামা রশ্মি যারা আধানবিহীন কণা তাদের আয়নায়িত হবার ক্ষমতাকে বোঝায়। আর এই রঞ্জন রশ্মি (X) যে পরিমান নির্দিষ্ট প্রভাব মানুষের উপর ফেলে সেই পরিমান প্রভাব উৎপন্ন করতে যে পরিমান তেজস্ক্রিয়তা বা তেজস্ক্রিয় বিকিরন প্রয়োজন তাকে এক রেম বলে। এটি প্রায় ১০০ আর্গ/গ্রাম এর সমান। তেজস্ক্রিয় দূষণ পরিমাপের একককে পিকোক্যুরী বলে। কখনো কখনো ক্যুরী বা মিলিক্যুরি কথাটি ব্যবহৃত হয়। তেজস্ক্রিয় মৌল স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন কণা বা রশ্মি (আলফা, বিটা, গামা) বিকিরন করতে করতে নতুন মৌলে পরিনত হয়। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে হারে ভাঙ্গে তাকে ক্যুরী বলে। এক কুরী তেজস্ক্রিয়তা বলতে বোঝায় যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রতি সেকেন্ডে $3.7X10^{10}$ বার ভাঙ্গে আর প্রতি সেকেন্ডে $3.7X10^{-2}$ বার ভাঙ্গলে তাকে পিকোক্যুরী বলে।

নিরাপদ মাত্রা

মানুষের উপর তেজস্ক্রিয়তার সর্বাধিক অনুমোদন মাত্রা নিয়ে গবেষণা করে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেকশান নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থা। এদের মতে পরমাণু শিল্পের কর্মীদের জন্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অনুমোদনমাত্রা প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ০.৩ রেম, যারা প্রত্যক্ষ প্রকটের মধ্যে থাকে (Direct Exposers) তাদের ক্ষেত্রে মান সপ্তাহে মাত্র ০.১ রেম অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীবৎ দশায় ২০০ রেম। অবশ্য এই সাধারণ মানেরও অনেক হেরফের আছে।

১) গর্ভস্থ ভ্রুন ও শিশুর ক্ষেত্রে ঃ সর্বোচ্চ বছরে ০.৩ রেম।

২) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বছরে ০.৫ রেম।

৩) সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ রেম।

৪) মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের সীমা আবার একটু অন্যরকম।

৫) চোখের লেন্স ঃ ৫০ রেম (বছরে)

সাধারণ মানুষ যাদের প্রত্যক্ষ প্রকট অবস্থার (Direct Exposers) মধ্য দিয়ে যেতে হয় না অর্থাৎ যারা কেবলমাত্র অপ্রত্যক্ষ বিকিরণের শিকার তাদের সহনশীল মাত্রা কিন্তু আরও কম—বছরে সর্বোচ্চ ০.১ রেম।

কিভাবে সংক্রমিত হয়

মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় সংক্রমন দু'ভাবে হতে পারে—প্রত্যক্ষ (Direct Exposers) এবং পরোক্ষ (Indirect Exposers)। প্রত্যক্ষ ভাবে বাতাসে ভেসে বেড়ানো তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণা এবং তেজস্ক্রিয় গ্যাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। তাছাড়া অনেক সময় দেহ কোষে সরাসরি বিকিরণ ঘটাতে পারে।

খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ ঘটলে তাকে অপ্রত্যক্ষ

এরপর 3 পাতায়

তেজস্ক্রিয়তা

1 পাতার পর

প্রকট (Exposers) বলে। পারমানবিক প্ল্যান্ট কারখানা প্রভৃতি জায়গায় অসর্তক হস্তান্তর এর কারণে মৃত্তিকা ও জল সংক্রমিত হয়। এরপর মৃত্তিকা ও জলে বসবাসকারী সমস্ত জীবকূলে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়।

কি ক্ষতি করে

শুধুমাত্র পেশাগত কারণে (তেজস্ক্রিয় আকরিক প্রক্রিয়াকরন, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, পরীক্ষাগারে গবেষণা ইত্যাদি) নয়, অন্যান্য পরিবেশগত কারণে, মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানুষের উপর অ্যাকিউট তেজস্ক্রিয় প্রভাব পড়তে পারে। কোষীয় স্তরে তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহকোষ এবং জননকোষে ক্রোমোজোমের অবাঞ্ছিত এবং স্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে—একে মিউটেশান বলে। ফলে ক্যানসার ও নানারকম শারীরিক অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এগুলি বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়। এছাড়াও তেজস্ক্রিয় দূষণের কতগুলি ক্রনিক প্রভাব লক্ষনীয়, যথা—

১) ফুসফুস এবং যকৃতের আলসার-যার পরিনতিতে ক্যানসার ও ফাইব্রোসিস রোগের প্রার্দুভাব;

২) রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) ও লিউকোমিয়া (ব্লাড ক্যানসার);

৩) মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ুর ক্যানসার;

৪) গর্ভনিক্ষেপ ও গর্ভস্রুটি কিংবা মৃত শিশুর জন্ম;

৫) স্নায়বিক বৈকল্য এবং স্মৃতি বিভ্রম;

৬) বন্ধ্যাত্ব ও থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা;

৭) বিভিন্ন অস্থিরোগ যথা নেক্রোসিস এবং অস্থি ক্যানসার;

৮) ত্বকের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন যথা অ্যাট্রফি, ইরাইথিমা এবং রঞ্জকের পরিবর্তন ইত্যাদি।

লেখক : চন্দন সুরভি দাস, অধ্যাপক, টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়
ফোন : ৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬, Emai : yenisi2002@gmail.com

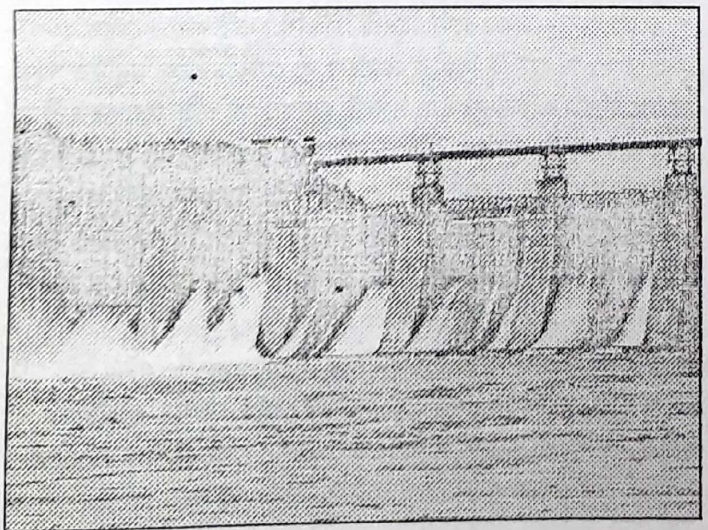

জলবিদ্যুৎ

শক্তির নতুন উৎস সন্ধানে

1 পাতার পর

ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের দিকেও মন দিয়েছেন। এত দিকে ভাবার পরও কিছু দিক রয়েছে যেগুলি সম্বন্ধে আমরা এখনও সেভাবে নজর দিইনি। যেমন জৈব বিদ্যুৎ ও জৈব প্রভা। এই উৎস দুটি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে প্রচুর। এই উৎস দুটির যথাযথ প্রয়োগে ভবিষ্যতে বদলে যেতে পারে শক্তির ব্যবহারের দিকটি। প্রথমে আলোচনা শুরু যাক জৈব বিদ্যুৎ নিয়ে এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়মে জীবদেহে সৃষ্ট বিদ্যুৎ যা মাছেদের দেহে উৎপন্ন হয়। ইলামোব্রাঙ্ক ও টিলিয়াট (লবনাক্ত ও স্বাদু জলের দুধরনের মাছ) শ্রেণীর প্রায় ২৫০ প্রজাতির মাছেদের দেহে এ ধরনের অঙ্গের উপস্থিতি দেখা যায়। এ ধরনের বিদ্যুৎ অঙ্গ থেকে ইলেকট্রিক ইল মাছ ২৭০-৫৫০ ভোল্টপর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। মাছেদের মধ্যে এরাই এত শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। জলের ভেতর এদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সর্ট সার্কিটের জন্য কমে যায় (২৭০ ভোল্ট) । আর ডাঙ্গায় আনলে ৫৫০ ভোল্টমাত্রায় বিদ্যুৎ শক্তিই পাওয়া যেতে পারে। ২৫০ প্রজাতির বিভিন্ন বিদ্যুৎ মাছেদের মধ্যে ইলেকট্রিক ইলের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক। এ বিদ্যুৎ তারা উৎপাদন করে দেহের দুপাশে অবস্থিত সারিবদ্ধ বিদ্যুৎ অঙ্গ দিয়ে। প্রতিটি বিদ্যুৎ অঙ্গ আবার অনুদৈর্ঘ্য ভাবে ৭০টি কলামের সঙ্গে সংযুক্ত ৬০০টি ডিমের মত ইলেকট্রোপ্লেট দ্বারা তৈরী। যদিও এগুলির প্রভাবে তাৎক্ষনিক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে মাছেরা এতমাত্রায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে অক্ষম। তবুও এটি একটি ইঙ্গিতমাত্র। কারণ এ থেকে গবেষণাগারে তৈরী করা যেতে পারে প্রকৃত বিদ্যুৎ যা জৈব ভাবে সৃষ্ট হবে। বায়োটেকনোলজির যুগে জৈবপ্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধে মানুষের আপত্তির বিশ্বব্যাপী যে সাড়া পাওয়া যায় তা এক্ষেত্রে থাকবে না। কারণ এতে মানব দেহে সরাসরি প্রভাব পড়বে না। তাই এমন কিছু সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হোক যা গৃহপালিত পশুদের (যেমন কুকুর) দেহে জৈব ভাবে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে এবং ঐ বিদ্যুৎ সাময়িক ভাবে লোডশেডিং এর সময় ব্যবহার করাও যাবে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত গবেষণার মাধ্যমে নিরন্তর ভাবে গৃহে ব্যবহার করার মত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করাও সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে জৈব প্রভা। বহু জীব তাদের দেহে আলোক উৎপন্ন করতে পারে। এটি জৈব প্রভা নামে পরিচিত। যেমন জোনাকি, জেলিফিস, শামুক, কস্ব জেলি, স্কুইড, গভীর সমুদ্রের ছোট চিংড়ি ইত্যাদি। এ ধরনের আলোক নিঃসারক জীবগুলি দেহে কিছু ব্যাকটেরিয়াকে আশ্রয় দেয়। যেগুলি ঐ আলোকের উৎস। কেউ কেউ আবার লুসিফেরিন ও লুসিফারেজ নামক প্রোটিন ও এনজাইমের ব্যবহার করে এ ধরনের আলো উৎপন্ন করতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। হতেই পারে এমন একদিন যখন বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে জৈবপ্রভার আলোই রাতে আলোকিত করবে আমাদের ঘর বাড়ি। তাই কাজ শুরু করতে হবে এখন থেকেই।

লেখক : ড. দেবজ্যোতি চক্রবর্তী
প্রধান স্নাতকোত্তর প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, কৃষ্ণনগর, সরকারি মহাবিদ্যালয়
ফোন : ৯৪৩৪১৪৮৮৫৩, Email : drdc64@gmail.com

বিকল্প শক্তি বিকল্প ভাবনা

3 পাতার পর

জার্মানী ৬, চিন ১.৬, ভারত ০.৭ বাংলাদেশ ০২., পৃথিবীর গরীব দেশগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে অবশ্যই এখনকার চাইতে খুব কম করে হলেও ৩-৫ গুন শক্তির উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (২০০৬) হিসেব করে দেখিয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী জুড়ে শক্তির চাহিদা বাড়বে প্রায় ৬৫ শতাংশ। আর এই চাহিদা মেটাতে গিয়েই বাতাসে মিশবে প্রায় ৭০ শতাংশ কার্বন। আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্লোবাল ইস্যুজ (২০০৬)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা যে হারে বাড়ছে তাতে এটি ২০৩০ সালের মধ্যেই দ্বিগুন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর বলাই বাহুল্য এশিয়াতে এর চাহিদা বাড়বে সবচেয়ে বেশী হারে কারণ এখানেই রয়েছে ভারত ও চীনের মত দুটি জনবহুল দেশ। বর্তমানের উন্নয়নের ট্রেন্ড-এর দিকে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে, এশিয়া মহাদেশের উন্নয়নের হার ভীষণ দ্রুত। ফলতঃ এই চাহিদা সামাল দিতে ২০২০ সালের মধ্যে আর ১৫০০ বড়বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আর এই যে চাহিদা, তা পূরণ করতে শতকরা ৯৫ ভাগ কার্বন জ্বালানী পোড়াতে হবে। আগামী ৫০ বছরের ভিতর পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়বে ৬৫০ কোটি থেকে ৯০০ কোটিতে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়বে তাল মিলিয়ে। তাহলে কি হবে? পৃথিবীটা তো আরো দূষিত হবে। এমনকি কোন উপায় আছে যার দ্বারা পৃথিবীটাও দূষিত হবে না আবার বিদ্যুৎশক্তির চাহিদাও মোলান দেওয়া যাবে? হ্যাঁ আছে। আর এখানেই প্রাসঙ্গিকতা অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত শক্তির।

এখন প্রশ্ন অচিরাচরিত শক্তি কাকে বলে? বিদ্যুৎশক্তি বা তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত শক্তির উৎসের ব্যবহার এখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত নেই, অপ্রচলিত সেই সব শক্তিকেই সাধারণভাবে অচিরাচরিত শক্তি বা অপ্রচলিত শক্তি বলে।

অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি কি কি?

অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি হল— সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ভূতাপীয় শক্তি, জোয়ার ভাঁটার জল, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি এবং আবর্জনা বর্জ্যপদার্থ ও বায়োমাসের মত জৈবিক শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তি বা তাপশক্তিকে অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত বা অফুরন্ত শক্তির উৎস বলা হয়।

কারণ কি? কারণ এই সমস্ত শক্তির কাঁচামালের ফুরিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এই অচিরাচরিত শক্তিকেই বলা হচ্ছে বিকল্প শক্তি। এই বিকল্প শক্তিই পৃথিবী বাঁচানোর চাবিকাঠি। সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে কারণগুলি হল—

১) খনিজ শক্তির প্রধান উৎস, যেমন—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস বা ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের দরুন ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে। ফলে এদের উপর ভরসা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অপরদিকে অচিরাচরিত শক্তিগুলি নিরাপদ কারণ তাদের ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

২) খনিজ শক্তির যে প্রধান কাঁচামালগুলি রয়েছে (যেমন—কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি) তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় নির্গত নানান রকম বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশ দূষণ ঘটায় কিন্তু বিকল্প শক্তির পরিবেশ দূষণ ঘটবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৩) বিকল্প শক্তির উৎপাদনে ব্যয় অনেক কম (দীর্ঘমেয়াদীর ক্ষেত্রে)।

৪) যেহেতু উৎপাদন ব্যয় অনেক কম তাই বিকল্প শক্তি চিরাচরিত শক্তি সম্পাদের তুলনায় অনেক সস্তা।

৫) বিকল্প শক্তির উৎপাদনে ব্যয় অনেক কম (দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে)

৬) যেহেতু উৎপাদন ব্যয় অনেক কম তাই বিকল্প শক্তি চিরাচরিত শক্তি সম্পাদের তুলনায় অনেক সস্তা।

৭) বিকল্প শক্তিগুলি খুব সহজেই পাওয়া যায়।

আর ঠিক এই কারণেই পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ এই বিকল্প শক্তির ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করেছে। বিকল্প শক্তি বা নবীকরণ বা অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত শক্তিকে এখন সবুজ শক্তি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে তার কারণ এই শক্তি দূষণ ছড়ায় না। পৃথিবীকে সবুজ, নির্মল রূপে গড়ে তুলতে এই শক্তিগুলিই প্রয়োজন) এবার একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন দেশ বর্তমান কতটা পরিমাণে বিকল্প শক্তি উৎপাদন করছে আর কতটা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে পরবর্তী বছরগুলির জন্য।

দেশ	সবুজ বিকল্প শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ %	লক্ষ্যমাত্রা
১। ব্রিটেন	৪.১	১০.৪% (২০১০-এর শেষ) ২০% (২০২০)
২। জার্মানী	১০.৪	১২.৫% (২০১০ এর শেষ) ২০% (২০২০)
৩। ফ্রান্স	১১.০	২১% (২০১০ এর শেষ)
৪। স্পেন	১৭.২	২৯% (২০১০-এর শেষ)
৫। ইতালি	১৬.৫	২৫% (২০১০-এর শেষ)
৬। আমেরিকা	১০.০	জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা
৭। চিন	৭.৭	১৫% (২০১০-এর শেষ)
৮। জাপান	৩.৯	৭% (২০১০-এর শেষ)

উৎস ঃ নিউ এনার্জি ফিনান্স, দ্য ইকনমিস্ট, ২০০৭, লন্ডন

এবার চোখ ফেরান যাক আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। বিকল্প শক্তি উৎপাদনে ভারতবর্ষের চিত্রটি ঠিক কি? এটি বুঝতে গেলে ২০০৯ সালের ২৯শে জুলাই দিল্লীর হোটেল লা মেরিডিয়াজে অনুষ্ঠিত চতুর্থ দঃ পূঃ এশিয়া অচিরাচরিত ও পূর্ণনবীকরণেযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী ড. ফারুক আব্দুল্লী, বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানী (দঃ পূঃ এশিয়ার দেশগুলির পরিবেশ বিজ্ঞানী ছাড়াও উপস্থিতি ছিলেন জার্মানী ও ফ্রান্সের দুজন বিজ্ঞানী), পরিবেশ গবেষক ও শিল্পপতি মিলিয়ে প্রায় ৩০০ অংশগ্রহণকারী। আয়োজক : অ্যাসোসিয়েশন অব চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডিয়া।

'Responding to future energy challenges'—এটাই ছিল সেই সম্মেলনের স্লোগান। কেন এই স্লোগান বেছে নেওয়া হয়েছিল? তা বুঝতে গেলে নতুন এবং পূনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব দীপক গুপ্তার বক্তব্য শুনতে হবে। তিনি বলেছেন, শক্তি সম্পদের প্রয়োজন ব্যাপক। দারিদ্র্য দূরীকরণে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং

এরপর 5 পাতায়

বিকল্প শক্তি বিরল্প ভাবনা

2 পাতার পর

কোন একটি অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক উন্নতির জন্য। কারণ প্রচলিত যে শক্তিগুলি বর্তমানে আমাদের চালিকাশক্তি তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, অনিয়মিত জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসভ্যতার বর্তমান সংকটে এই পূর্ণবীকরণযোগ্য শক্তি বা বিকল্প শক্তিই প্রধান প্রতিষেধক—এই ছিল বিকল্প শক্তি সম্মেলনের প্রেক্ষাপট। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু ভাবনা বিষয়টি একরকম আর তার বাস্তবায়ন হল আরেকটি বিষয়। একটু বিশদে বলি।

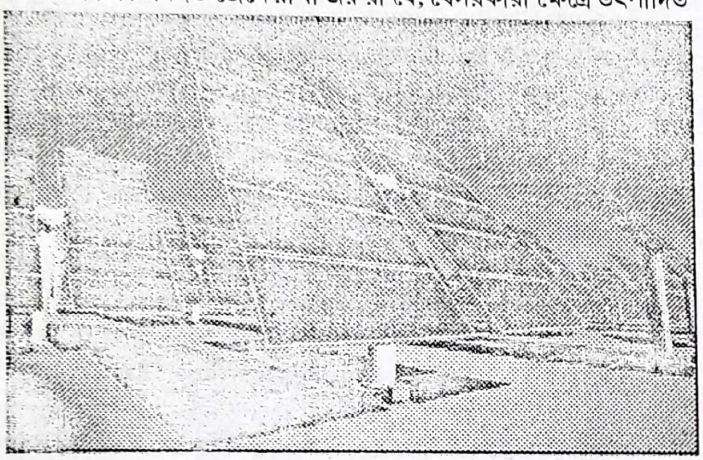

চিন্তার কারণঃ বর্তমানে ভারতবর্ষের মোট শক্তি উৎপাদনের ৯ শতাংশ আসে বিকল্প শক্তি থেকে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই পরিমাণ পৌঁছাবে ৩০ শতাংশে। প্রসঙ্গত জেনে রাখা জরুরী যে, বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদিত

মোট বিকল্প শক্তি উৎপাদনের ৬০ শতাংশই চলে যায় বিদেশে। কিন্তু যদি তা দেশের প্রয়োজনেই লাগত? তাহলে তো সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট-এর ক্ষেত্রে, পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতির প্রয়োগে ভারতবর্ষ যে একটা 'বিশালাকায় লাফ' দিতে পারত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও, ভারতীয় ইনভেস্টরদের মনে রাখতে হবে যে, এখনও ভারতবর্ষের এমন অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, এমনকি বিদ্যুতের ধারণাও পৌঁছায়নি। কতশত 'স্বপ্ন' 'আলো' দেখতে পাবার 'আজন্ম আকাঙ্খা' নিয়েই চলে গিয়েছে পৃথিবী ছেড়ে। অতএব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি নিজেদের বিবেক, কর্তব্য, দায়বদ্ধতাকে অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে তাহলে যে নিজের জন্মদাত্রী দেশমাতার পেছনের সারিতে থাকবে। তাই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের আবেদন, উপরিক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান সহ আগ্রহী সংস্থাগুলি যেন এই বিষয়টিই সর্বাগে খেয়াল রাখে। (ভারতবর্ষের ৮৪ শতাংশে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে আর ৮৮ শতাংশ গ্রামীন বাড়িতে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তথ্যঃ সোলার ইন্ডিয়া অনলাইন)

বর্তমানে ভারতবর্ষের মোট শক্তি উৎপাদনের প্রায় ১৩,৫০০-১৫,০০০ মেগাওয়াট শক্তি আসে এই বিকল্প শক্তি সম্পদ থেকে। যার মধ্যে ৯৭০০ মেগাওয়াট শক্তি সরবরাহ হয় বায়ু থেকে। তবে মোট সম্ভাবনার ভিত্তিতে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষে বায়ুশক্তির সম্ভাবনা রয়েছে ৪৫০০০ মেগাওয়াট, বায়োমাস থেকে ৪৫,০০০ মেগাওয়াট, সৌরশক্তির সম্ভাবনা ৫০,০০০ মেগাওয়াট, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎশক্তি প্রকল্প ১৫০০০ মেগাওয়াট (তথ্যসূত্র ঃ সোলার ইন্ডিয়া অনলাইন)। এক্ষেত্রে সৌরশক্তির সম্ভাবনার কথাটি বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই।

অক্ষবেশগত অবস্থান অনুযায়ী ভারতবর্ষ এক বছরে প্রায় ৩০০-৩৩০ দিন রৌদ্রকরোজ্জ্বল পরিবেশ পায় শুধুমাত্র সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়েই দেশের শক্তি সম্পদের সমস্যা দূর করা যায়। বিকল্প শক্তিগুলি থেকে সেখানে পাওয়া যায় ১২,২৪২ মেগাওয়াট সেখানে সৌরশক্তি থেকে উৎপাদিত হয় ৯.৮৪ মেগাওয়াট। ভারতে ইন্টিগ্রেটেড রুরাল এনার্জি প্রোগ্রাম এর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৩০০ জেলায় ২০০০ গ্রামে সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে (সোলার ইন্ডিয়া অনলাইন ২০০৯)। বর্তমানে সৌর তাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন (Solar Thermal Electri Generation or STEG) প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক একটি আসা। এইক্ষেত্রে হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, ভারতবর্ষের মোট ভূমি ভাগের মাত্র ০.৩% অঞ্চল যদি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবহার করা যায় তাহলেই তা আমাদের সমগ্র দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারবে। এবং নবগঠিত নতুন এবং শক্তি মন্ত্রকের সৌরশক্তি জনপ্রিয়করণের যে উৎসাহ এবং আগ্রহ তাতে আশান্বিত হওয়াই যাই।

এতক্ষণ পর্যন্ত পড়বার পর পাঠবর্গের মনে হতে পারে যে যাক আমরা অন্তত বুঝতে পারছি যে, বিকল্প শক্তি-বিকল্প ভাবনাই আমাদের ভবিষ্যত। এটা ঠিকই কিন্তু আমাদের পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। কিন্তু কেন এই কথাটি লিখলাম? সেই গল্পটিই শোনাচ্ছি। নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের সচিব সেই কথাটিই শোনালেন। তিনি বললেন, আমরা এখনও ঠিক করে মাইন্ডসেটই করে উঠতে পারিনি। মানে!! আবার মাঝে হঠাৎ এই রকম নিরাশাজনক কথা কেন? আসলে তিনি বাস্তবচিত্রটি তুলে ধরেছেন। তার কথায় তিনি নিজের মন্ত্রক এবং অন্যান্য রাজনীতিকদের শত চেষ্টা করেও বারবার বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন বিকল্প শক্তির চিন্তাভাবনার কথা। একি শুনছি আমরা? নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রকে যারা কর্মরত তাদের মধ্যেই এমনতর ভাবনা! যাদের সর্বাগ্রে পরিবেশ বান্ধব মন গড়ে ওঠার কথা, তাদেরই এমন উদাসীনতা-মতবিরোধ। কিন্তু যারা রাষ্ট্রনায়ক। সমগ্র দেশের দায়িত্ব যাদের হাতে তারা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না এর গুরুত্ব? এ যে সর্ষের মধ্যেই ভুত। এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সে, এই যে মাইন্ড সেটের সমস্যা এটা রয়েছে সর্বস্তরেই। যার জন্য এত ভাবনা চিন্তা সত্ত্বেও সৌরশক্তি কিংবা অন্যান্য বিকল্প শক্তির ভাবনাটিকে এখনও মাইলেজ দেওয়া গেল না। আমরা এখনও পড়ে রয়েছি মাইন্ড সেটের প্রাথমিক প্রশ্নেই। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে এবং নেপাল সে এ বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে তা বোঝা গেল ওই দুই দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কথায়। দুজন হলেন সঈদ অভির হুসেন, সিইও, ক্লাইমেট চেঞ্জ কোম্পানী, বাংলাদেশ এবং বাবু রাজা শ্রেষ্ঠা, চিফ সায়েন্টিস্ট, সেন্টার ফর রিনিউএবল এনার্জি, নেপাল। উপরোক্ত দুজন বিকল্প শক্তির জনপ্রিয়করণের যে প্রচেষ্টা এবং ফলাফল পরিবেশন করলেন উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

একথা বুঝতে এবার একটু চোখ ফেরাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে।

এরপর 6 পাতায়

বিকল্প শক্তি বিকল্প ভাবনা

5 পাতার পর

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুন্দরবনের কিছু অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ জনপ্রিয়করণের একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা এখনও হালে পানি পায় নি। এক্ষেত্রে কিন্তু এগিয়ে গিয়েছে, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু সহ অন্যান্য রাজ্য। এ রাজ্যে 'সৌরগ্রাম' এখনও সেই অর্থে তৈরী হল না। এমনকি সৌরশহর রূপে যে শহরগুলি আগামীতে গড়ে উঠবে তার মধ্যেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোন শহর নেই।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের দীঘা, শংকরপুর ইত্যাদি সমুদ্র উপকূলের বায়ু শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনারও সেই অর্থে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগই এখনও চোখে পড়ল না। তবে শুধু সৌরশক্তি কিংবা বায়ুশক্তি নয়, জোয়ার ভাঁটা থেকে প্রাপ্ত শক্তি, বায়োগ্যাস থেকে উৎপন্ন শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, বর্জ্য থেকে উৎপন্ন শক্তি ইত্যাদি সমস্ত প্রকার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

আসলে বিষয়টি শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরই। তাই কাম্বে উপসাগরে জোয়ার ভাঁটার শক্তি, ছোটনাগপুর অঞ্চলের ভূ-তাপীয় শক্তি, বায়ো গ্যাসের কাঁচামালের নিরন্তর যোগান ক্ষেত্র হিসেবে ভারতবর্ষের প্রতিটি সম্ভাবনাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাস্তবায়িত করতেই হবে। কারণ অজ্ঞতা, অসচেতনা আর বিজ্ঞানভিত্তিক দূরদৃষ্টির অভাবে জীবাশ্ম জ্বালানীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস যেমন প্রতিনিয়ত কলুষিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে এইসব সম্পদের ভান্ডার। তাই বিকল্প শক্তির সঠিক প্রয়োগে কোমর বেঁধে নামতে হবে এক্ষুনি। এটাই সেই সময়।

আর বৃহত্তম ক্ষেত্রে ১৯৯৭-এ কিয়োটো প্রোটোকলের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মিশন (সিডিএম)-এর দিকে এগিয়ে যেতে দূর করতে হবে উন্নত ও উন্নয়শীল বিশ্বের বিতর্কিত নর্থ-সাউথ ডিবেট। বিকল্প শক্তির মত প্রাসঙ্গিক বিকল্প ভাবনায় আমেরিকারও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনমতেই অস্বীকার করা চলবে না, ঠিক তেমনি আমাদেরকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে শিক্ষা পৃথিবী ও তার পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হবে, বন্ধু হবে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে একযোগে কাজ করতে হবে। নইলে আশার আলো নেই বললেই চলে।

—তুহিন শুভ্র মন্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬ / ৯৪৭৫৯৩১২৯০

প্রসঙ্গ : সৌরপার্ক

'প্রথম আদ তব শক্তি'

আদিত্য অর্থাৎ সূর্যকে বলেছেন আমাদের কবি। সৌরশক্তি যে প্রথমতম এবং প্রধানতম শক্তির উৎস, এ ব্যাপারে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। এহেন সূর্য যখন মাথার উপরে প্রচন্ড ভাবে জ্বলতে থাকে তখন জৈব শরীরে ও মনে তার একটা না বাচক প্রভাব পড়ে বই কি। মরুভূমি থেকে মানুষের মনোভূমির দূরত্ব ক্রমে কমে আসে। 'খরা মাঠে পোড়া বসন্তে'র ছায়া পড়ে চরাচরে। তৃষ্ণা তৃষ্ণা...এইতো সেদিন পর্যন্ত এমনই চলেছিল। হ্যাঁ, বলছিলাম; এক যে ছিল গ্রাম.... না গ্রামটা এখনো আছে, আছে গুজরাটে নাম তার চরণকা গান্ধীনগরে। এই তো সেদিন (গত ১৯শে এপ্রিল, ২০১২) আমাদের সৌরশক্তির একটি মুখ্য ভান্ডার হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। ২০১০ সালে (Clinton Climate Initiative) সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে জানা গেছে গুজরাটের এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল গ্রামটির নাকি প্রত্যক্ষ সৌর তেজস্ক্রিয়তার স্তর রীতিমতন উচ্চ পর্যায়ের।

গুজরাটের প্রধান নগরী আহমেদাবাদ থেকে প্রায় ২২৫ কি.মি দূরে কুচ জিলার সীমান্তবর্তী এই চরণকা প্রতি একক অঞ্চলে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌর তেজস্ক্রিয়তা পায়। এখানেই নির্মিত হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম সৌর পার্ক (উদ্যান?) যা ২১৪ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। আর এই বিপুল উৎপাদন ক্ষমতার জন্যই এটি ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে চীনের গোলমুড সৌরপার্ককে যার উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ২০০ মেগাওয়াট। ফলতঃ চরণকা ছিনিয়ে এনেছে চীনের হাত থেকে এই বিশেষ গৌরবের মুকুটখানি। যা ছিল একদিন ঊষর মরুভূমি তা এখন নয়নসুখের অন্যতম সুন্দর এক প্রেক্ষা পটভূমি।

২০০৯ সালে গুজরাট সরকারের সৌরশক্তি পর্ষদ এর শিলান্যাস করেন যার প্রাথমিক লক্ষ মাত্রা ছিল ১০০০ মেগাওয়াট কিন্তু বৃহত্তর ভারতবর্ষ ২০২০ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট অথবা ২০ গিগাওয়ার্টস শক্তি উৎপাদন করতে দায়বদ্ধ। গুজরাট এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা তথা অবদান রাখার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বলাইবাহুল্য এই সমস্ত কর্মকান্ডের সূচনায় আছে সেই অখ্যাত গ্রাম চরণকা মাত্র সাতশো থেকে আটশো যার জনবসতি। গুজরাট সরকার ইতিমধ্যেই ৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম আরো কয়েকটি সৌরশক্তি প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এই মর্মে অর্থাৎ নির্মাণকল্পে মোট ৫০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। গুজরাটের এই সমস্ত সৌর প্ল্যান্ট নির্মানে ৯০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সম্মতি জানিয়েছেন শিল্পপতিরা। এইসব প্ল্যান্টগুলি প্রতিদিন তিন মিলিয়ন বিশুদ্ধ অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপন্ন করতে পারবে বলে আশা করা যায় যা ১ মিলিয়ন বাড়িকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিতে পারবে বলে বিশ্বাস।

গুজরাট পাওয়ার লিমিটেড এই সৌর পার্ক সমূহের পরিকাঠামোর বাস্তবায়নের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এছাড়াও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক গুজরাটকে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত কর্পোরেশন পার্ক থেকে উৎপাদিত উপজাত পদার্থ এবং বর্জ্যবস্তুগুলির অতিদ্রুত এবং যথাযথ নিষ্কাশণ ও প্রেরণের ব্যবস্থাপনায় ৬৫০ কোটি টাকা ধার্য করেছে।

সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুজরাট তথা ভারত একদিন সারা বিশ্বকে পথ দেখাবে, এমনই উচ্চাশা বিশেষজ্ঞদের। শুধু তাই নয়, ভারতের শক্তি ও নিরাপত্তার সমস্যা সমাধানে এটি হবে এক বিশাল পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে ক্রম বর্দ্ধমান পরিবেশ দূষণ ঘটিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এইসব সৌর পার্কের ভূমিকা হবে অবিসংবাদিত, কার্যশীলতায় অমোঘ।

—জগন্ময় মজুমদার, কান্তি চন্দ্র হাইস্কুল, শ্যামনগর।

কেন আমরা পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে

"মানুষ এখনও পরমাণু চুল্লির সাথে বিশ্বাসে ঘর করবার মতো বড় হয়ে ওঠেনি"। — নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার জর্জ পোর্টার

কিন্তু এ কথা কে জানাবে যে গত দুদশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরমাণু শক্তি প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে? এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে পরমাণু শক্তি বিকাশের কাজে ভাটাও পড়েছে। বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণা, সমীক্ষা ও গণ আন্দোলনের ফলে বর্তমানে সারা বিশ্বের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন—

১) পরমাণু বিদ্যুৎ শক্তি সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নয়। বিকল্প অপ্রচলিত পুনর্নবিকরণ অসংখ্য উৎস রয়েছে। ভারত তথা পঃবঙ্গের ক্ষেত্রে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, সমুদ্রশক্তি প্রভৃতির অনেক সম্ভাবনা—যা পরিবেশের উপযোগী এবং কম খরচ সাপেক্ষ।

২) রাশিয়ার চেরনোবিলের মতো দুর্ঘটনা না ঘটলেও যে কোনো তথাকথিত নিরাপদ পরমাণু চুল্লিই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়াবহ। পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর প্রভাব কোনো দেশ-কালের গণ্ডী মানে না।

৩) পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তথা সামগ্রিক পরমাণু প্রযুক্তির কারণে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়তা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে। তাই যে কোনো চুল্লির চারপাশে মানুষজনের মধ্যে বাড়ছে ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি, জীবকোষের জীন বিকৃতি কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম।

৪) পরমাণু চুল্লির বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ সংরক্ষণ পৃথিবীর কোনও দেশে আজ অবধি সম্ভব হয়নি। এমনই একটি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বর্জ্য মৌল প্লুটোনিয়াম—যা বর্তমানে বহুল নির্মিত পরমাণু বোমার একমাত্র কাঁচামাল। সুতরাং পরমাণু শক্তি যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধাস্ত্র প্রচেষ্টার অঙ্গ। শান্তিপূর্ণ পরমাণু শক্তি পরমাণু অস্ত্র আড়ালের চেষ্টা মাত্র।

৫) অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসের কথা বাদ দিলেও বলা যায় একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের খরচ সমক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের খরচের থেকে প্রায় ২.৫ গুণ বেশি। এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ, বর্জ্য পদার্থের সংরক্ষণের হিসাব নিলে এই খরচ দাঁড়ায় প্রায় ১০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। প্রকৃতপক্ষে এই খরচগুলো কাঁচামাল খরচের চেয়ে অনেক বেশি এবং সুকৌশলে এই খরচগুলো বাদ দিয়ে খরচ কম দেখানো হয়। সুতরাং পরমাণু বিদ্যুৎ সস্তা এটি স্রেফ একটি ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশ্বে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরমাণু দুর্ঘটনা ঘটে কানাডার চক-রিভার অঞ্চলে, ১৯৫২ সালের ১২ ডিসেম্বর। বছর তিনেক আগে পরীক্ষামূলক ভাবে সেখানে পরমাণু চুল্লিটি বসানো হয়েছিল। দুর্ঘটনার ফলে ৪০ লাখ টন তেজস্ক্রিয় জল পরিবেশে মিশে যায় এবং ৪ লাখ বর্গমিটার অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫৭-র ৮ অক্টোবর ইংল্যান্ডের উইন্ডস্কেলের পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনার ফলে সরকার বাধ্য হয়ে এর চারপাশে পুরু কংক্রিটের দেওয়াল তোলে কেন্দ্রটিকে কবরস্থ করতে।

১৯৬১ সালে আমেরিকার ইজাহোর চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটে। তার আগে আরও পাঁচটি চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। রাশিয়াতে ঘটে ১৯৫৮ সালে দক্ষিণ উইরালে। খবরটি প্রথমে চাপা ছিল। পরে খবর পেয়ে হাজার হাজার লোক ওই অঞ্চ ল ছেড়ে পালিয়ে যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডে। চুল্লির ভেতরে প্রায় ১৫০ ঘনমিটার আয়তনের একটি হাইড্রোজেন বলয় তৈরি হয়েছিল। বলয়টি আরও বড় হতে থাকলে বা আরও কিছু সময় পেলে 'WASA-740' রিপোর্টকেও টেক্কা দিতে পারত। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, বড় মাপের পরমাণু চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটলে ৩৪০০ মানুষের তাৎক্ষনিক মৃত্যু হবে, তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবে ৪৩০০০ জন, সম্পত্তি বিনষ্ট হবে ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। ১,৫০,০০০ বর্গ কিমি আবাদি জমি তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবে। রাশিয়ার চের্নোবিল চুল্লির দুর্ঘটনার কথা সবাই জানেন।

২০১১ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে এখন প্রায় ৫০০ পরমাণু চুল্লি রয়েছে। বড় রকমের উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রায় একশোর মতো। ছোটখাটো গোলযোগ কয়েক হাজার।

ভারতের নয়টি পরমাণু চুল্লি তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকেও কাজে লাগাতে পারেনি। কয়েকটি চুল্লি উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। ১৯৯০ সালে 'ওয়াচ-ডগ' এবং গোপন এজেন্সির খবরে জানা যায়, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশের পরমাণু কেন্দ্রে প্রায় ১০৫টি ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রকাশ করেনি। ১৯৯৩ সালের আর এক রিপোর্টে জানা যায়, দেশের প্রায় সবকটি পরমাণু চুল্লিতেই যে কোনও সময়েই বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ১৯৯৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড নিউজ সার্ভিস'-এর খবরে জানা যায় প্রাক্তন প্রধান এ গোপালকৃষ্ণন পরমাণু চুল্লিগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করেন। এ কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে পরমাণু চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে; Nuclear Power Corporation এর বিজ্ঞানীদের আশ্বাসবাণী আসলে মিথ্যে আশ্বাস।

প্রতিবেদক —জয়দেব দে।

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশিত

কেন পরমাণু চুল্লী চাই না ......মূল্য ১২ টাকা

পরমাণু বিদ্যুৎতের বিকল্প চাই.... মূল্য ২০ টাকা

পড়ুন ও সংগ্রহ করুন।

ফুকুশিমা : প্রকৃতির প্রতিশোধ

জগন্ময় মজুমদার

চেরিফুল ফুটে আছে
উদিত সূর্যের দেশে।

সিন্টো সন্ন্যাসীর ধ্যান
তখনো ভাঙেনি।

পূর্বদেশে শান্ত মেঘ মালা, হাওয়া টান
প্রশান্ত সমুদ্রের জলে
ছিঁড়ে যাচ্ছে তরঙ্গমেখলা
জাহাজের মাস্তুলে উড়ুক্কু মাছের ক্ষণিক বিশ্রাম।

এছাড়া বিশ্রাম কই সূর্যঘড়িতে ?
ঘড়ির কাঁটায় বসে দিন যায় রাত্রি আসে
মানুষ-মৌমাছি
ওড়ে আর ওড়ে ব্যস্ততার বিভিন্ন আকাশে.

সেদিনও এমন ছিলো
যে বালিকা স্বয়ং পুতুল, পরেছে কিমানো
যে বালক ভুলে গেছে শেষ কবে উড়িয়েছে ঘুড়ি
রোবোটের কপালের মধ্যখানে বানিয়েছে তৃতীয় নয়ন।

ত্রিকালজ্ঞ টাইরেসিয়াস
উদাসীন দেখে যান ওই চোখে :
আগুন-স্রাগন
মাটি থেকে আকাশ অবধি
এক হাজার সূর্য কিরণ
পুড়ে যাচ্ছে ঘর বাড়ি পুড়ে যাচ্ছে বন
একটি অগাষ্ট মাস কেঁদে কেঁদে বাইশে শ্রাবণ...

পৃথিবী ভোলে না
সবচেয়ে দীর্ঘতর বিষাদের স্মৃতিময় হাত
টেনে রাখে হিরোশিমা নাগাসাকি রাত।

একদিন মাথা উঁচু আবার দাঁড়ালো ফুজিয়ামা
বরফে বরফে ঢেকে গেল চূড়া
চূড়ার উপরে স্থির, হাত বাঁধা একটি কঙ্কাল
চোখের শূন্য থেকে রক্ত
দশন পঙ্‌ক্তি থেকে গলে পড়ছে মাংসের তাল।

ধোঁয়া উড়ছে ওই দ্যাখো পোড়া মাংসগুলি
শিককাবারের ঘ্রাণে গাঢ় আর্তনাদ
পরমাণু চুল্লির মতো কোনো প্রেসার কুকার ?
হাইকু পৃথিবীর মানুষের লাশ
মুহূর্তে কেলাস।

চুল্লির ভিতরে গর্ভে কি ছিলো এমন ?
মৃত্যু নিয়ে জীবনের ছেলেখেলা
সূতোর উপরে হেঁটে চলা ভবিষ্য পৃথিবী
ডাক নাম ফুকুশিমা ?

না—
ফুকুশিমা গাঢ় এক দীর্ঘশ্বাসের নাম
ছুটি হীন বস্তু পৃথিবীতে প্রকৃতির প্রতিশোধ
সমুদ্র তলের প্লেটে দ্বান্দ্বিক বিতর্ক আসর ....

কি জানি ফুরাবে কবে
উড়ে যাবে অবশেষে পিকাসোর কবুতর
চেরিগাছ মাথা নুয়ে বলবে আবার : ভালবাসো
ডানার বাতাসে ঘষাঘষি লেগে উঠবে আওয়াজ :
অ্যারিব্যাকো গোজাইমাস *
হে প্রযুক্তি মানবিক বিজ্ঞান : অ্যারিব্যাকো...

**জাপানি ভাষায় অ্যারিব্যাকো গোজাইমাস অর্থাৎ ধন্যবাদ*

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in